“ভ”

দীপা বর্মণ

মনন প্রকাশ

পঞ্চাশ (গল্প)

পঞ্চাশ। সংখ্যাটা নেহায়েত কম নয়।আলো আজকে পঞ্চাশ টাকার গর্বিত মালিক। অবশ্য ঘর থেকে বের হলে আজই হাতের পাঁচ এই পঞ্চাশ টাকা আর থাকবে না। যেখানে ওর যাওয়ার কথা, সেখানে যাওয়া আসার খরচ পড়বে সত্তর টাকার মতো। পঞ্চাশ টাকা খরচ করার পর কপর্দকশূন্য শূন্য হয়ে বাকি বিশ টাকার ব্যবস্থা কীভাবে করবে সেটা ও ভেবে নিয়েছে। বিশ টাকার পথ সে হেঁটে কভার করবে। ও মনে মনে ভাবে ,বয়স কতো হলো ওর? ও কি পঞ্চাশে আছে ? নাকি পেরিয়ে গ্যাছে? সংখ্যাটা না হয় পরে হিসেব করে বের করে নেয়া যাবে। তবে এই মুহূর্ত পর্যন্ত সে পঞ্চাশ টাকার মালিক। দুতিনদিন যাবত পঞ্চাশ সংখ্যাটা ওকে খুব ভাবাচ্ছে। বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে কিছু স্মৃতি মনের কোণে বার বার উঁকিঝুঁকি মারছে। বুকের ভেতর হাসি আর কান্নার ঢেউ উঠানামা করছে। একটা চাপা কষ্টের অট্টহাসি ডগমগিয়ে বের হতে চাইছে। পারছে না। বারবার মুচকি হাসিতে মিলিয়ে দিচ্ছে। মজার ঘটনা! আলো তখন অনার্সে পড়ে । একদিন ক্লাসের কয়েক বন্ধু মিলে সদরঘাট মানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভিক্টোরিয়া পার্কের বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে চেপে বসেছে। উদ্দেশ্য, তেজগাঁ সামরিক অস্ত্রমেলা দেখতে যাওয়া। সময়টা কোনো একটা মাসের শেষ সপ্তাহ; নয়তো শুরু। পড়ালেখার পাশাপাশি টিউশনি করে ভালোই টাকা আসে আলোর হাতে। তবুও মাসের শেষ কিংবা শুরুর দিনগুলো বেশ হিসেব করে চলতে হয় ওকে। বলছিলাম, কয়েক বন্ধু মিলে অস্ত্রমেলায় যাওয়ার জন্য বাসে চেপে বসেছে। খুব ভীড়। বাসের বনার আর সিট মিলিয়ে ভাগাভাগি করে বসার জায়গা হলো ওদের। তা, বাসে বসে যাও আর দাঁড়িয়েই যাও, ভাড়া তো মিটাতে হবে? বাসের কন্ডাক্টর যখন ভাড়া কাটতে এলো, সাথে থাকা টগবগে তরুণ বন্ধুরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। আলো না হয় সাথে থাকা বান্ধবীর ভাড়া মিটিয়ে দেবে কিন্তু,চার চারজন দামড়া ছেলে বন্ধুদের ভাড়া দিতে যাবে কোন দুঃখে? ও মনে মনে গজর গজর করে। যাই হোক আর তাই হোক, ওর কাছে যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা পঞ্চাশ টাকার নোটটা কিছুতেই বের করবে না। ভাড়া না মিটানোর কারণে কন্ডাক্টর যদি ওদের বাস থেকে মাঝপথে নামিয়ে দেয়, দিক। আলো হেঁটে চলে যাবে। আশ্চর্য! যার যার ভাড়া সে নিজেই মিটিয়ে দিলেই তো হয়? লেঠা চুকে যায়! সাফ সাফ দুইজন বলে দিলো-টাকা নাই। বাকিরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। চোখ ফিরিয়ে নিরুদ্দেশ তাকিয়ে যেন যাত্রাপালা দেখছে। আলো ওদের উদ্দেশ্যে বলে এ্যাই, তোদের কাছে টাকা নাই তাইলে মেলায় যাওয়ার শখ উঠল ক্যানরে? এ্যাহ! শখ হইসে অস্ত্র মেলায় যাইবো। মেশিনগান, স্টেনগান, কাটা রাইফেল দেখবো। যা না লাইনে গিয়ে দাঁড়া? পুলিশে চাকরি করলে সবই হাতায়া হাতায়া দেখতে পারবি। অবশ্য পরে ওদের একজন অনার্স পড়া শেষ না করেই পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিল। আলো যখন ওর বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বকবক করছিল, কন্ডাক্টর ওকে বলে- আপা ভাড়া না দিয়া নিজেগোর মইধ্যে ঝগড়া করতাছেন ক্যান? আলো কন্ডাক্টরের মুখের কথা লুকে নিয়ে বলে- দেখেন তো ভাই, পকেটে টাকা নাই অস্ত্র মেলা দেখার পিতলা শখ হইল আর অমনি বাসে চাইপা বসলো? ভাই, আপনি আমাদের নামাইয়া দেন। এরা পদব্রজে অস্ত্র মেলা দেখার সাধ পূরণ করে আসুক। আমি উল্টা পথ ধরি। আলো কথাগুলো এমন ভঙ্গিমায় বলছিল যে, ওদের সমবয়সী কন্ডাক্টর বেটা হেসে দিয়ে বলে, আপা ঝগড়া কইরেন না, আপনেগো ভাড়া দেওন লাগবো না। কিন্তুক, যাইবার সময় কেমনে যাইবেন? ওস্তাদ হ্যাগোরে অস্ত্র মেলার সামনে রাইখা যাইয়েন। ছাত্র মানুষ, ভাড়া দেওনের ট্যাকা নাই। চালকের আসনে বসা যুবক বয়সী লোকটি ক্ষণিক তাকিয়ে মুচকি হাসে। সেই ঘটনার কথা মনে হলে এখনও খুব হাসি পায় আলোর। আহা! সেই মিষ্টি মধুর খুনসুটির দিনগুলো কতই না মজার ছিল। আলো ভাবে আচ্ছা, সেই দিনগুলো আরেকবার ফিরে পাওয়ার কোন সুযোগ নেই? কী রঙিন দিনগুলো! অ্যাম্বুলেন্সের বিকট সাইরেন আলোর রঙ্গিন ভাবনায় ছেদ কাটে। এক অটো ছেড়ে আরেক অটোতে চেপে বসে। ইদের বাজার। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাড়া দ্বিগুণ। নইলে আজকের দিনটা পঞ্চাশের মধ্যেই চালিয়ে নিতে পারতো। পঞ্চাশ। বিয়ের পর বিরাট এক দাগ কাটা সংখ্যা আলোর জীবনে। এ দাগ কখনই মুছে যাওয়ার নয়। কক্ষনো না। বিয়ের প্রায় বছর দুয়েক পর। আলো প্রথম সন্তানবতী। সাধ ভক্ষণের রাত। বাড়িতে কাছের কিছু আত্মীয়-স্বজন এসেছে। দুটো মাত্র ঘর। ঘরের তুলনায় লোকসংখ্যা বেশি। সঙ্গত কারণে, দুই ঘরেই খাটের উপর আর মেঝেতে বিছানা ভাগাভাগি করতে হয়েছে। আলো যে ঘরে ঘুমিয়েছে, ওর স্বামী ছাড়াও আরো তিনজন

প্রাণী মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছে। আলোর পীড়াপীড়িতেও ওরা খাটের উপর ঘুমোতে রাজি হয়নি। সারাদিন এ নিয়ম সে নিয়ম মানতে মানতে ও খুব ক্লান্ত। বালিশে মাথা রাখতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় আলো। এমন ঘুম যে, বাড়িতে ডাকাত পড়লেও টের পেতো কিনা সন্দেহ। ঘুম যতো গভীর হোক বা ক্লান্তি যতই থাকুক খুব ভোর ভোর বিছানা ছাড়া ওর ছোটবেলার অভ্যাস। সেদিনও ব্যতিক্রম হয়নি। সকাল বেলার সব কাজকর্ম শেষ করে স্নান সেরে সবে উঠোনে দাঁড়িয়েছে। স্বামীর অভিযোগমাখা প্রশ্ন- আমার পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা কে নিছে? শুনে আলো হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। শাশুড়ি, ননদ সকলের সন্দেহের তীর ওর দিকে। এ নিয়ে মোটামুটি একটা শোরগোল হয়ে গেলো। বড় ননদ আলোর নামে পঞ্চাশ টাকা চুরির অভিযোগ মুখে মুখে চোরের ট্যাগ লাগিয়ে দিতে দুবার ভাবলো না। এই পঞ্চাশ টাকা চুরির ঘটনা শুধু বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। ননদ তার নিজের সাফাই গাইতে গাইতে পাড়াময় বলে বেড়াতে লাগলো আমার জামাই হাজার হাজার টাকা আইনা আমার হাতে জমা রাখে। কোনদিন এক পয়সা এদিক সেদিক হয় না। তাইলে কি আর জামাইয়ের ঘর করতে পারতাম? তার গলার স্বর এতটা উচ্চগ্রামে যে, আশেপাশের সাত বাড়ি পর্যন্ত অনায়াসে প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে কারো কষ্ট হয়না। এমন দোষে দোষী আলো হাপুস নয়নে কাঁদে আর মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে-ভগবান তুমি আমাকে উদ্ধার কর। এই অপবাদ নিতে পারছি না। ওর ইচ্ছে হচ্ছে মরে যেতে। তা সম্ভব নয় ।ওর শরীরে যে আরেকটি প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। আলো সজোরে দুপায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কিছুটা মাটি খুঁড়ে গর্তের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে দুই হাত একসাথে মুঠো করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাটি বসুমতি তুমি আমাকে ধৈর্য দাও, স্থিরতা দাও-বাক্যটি ওর মনে ভীষণ আলোড়ন তুলছে। ভীষণভাবে। সেই আলোড়নের ঢেউ ওর চোখে জলোচ্ছ্বাস এর মতো প্রবাহিত হচ্ছে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! লজ্জায় কুঁকড়ে আছে আমন্ত্রিত আলোর জা আর ওর শ্বশুর মশায়ের পাতিয়ে দেওয়া ধর্ম ভাইটিও। এতসব হই হাঙ্গামা একটু নীরব হলে পাতানো ভাইটি আলোর কানে কানে কিছু একটা বলে, ওকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু না খেয়েই চলে গেলো। তাকে যেতে বারণ করবে বা কিছু খেয়ে যেতে বলবে সেই ইচ্ছে আলোর মধ্যে একটুও কাজ করছে না। এখন শুধু ওর রক্তে হিমশীতল বাতাস বয়ে চলছে। বিয়ের পর একই ধরনের আরও দুই একটি ঘটনা ঘটেছে ওর জীবনে। সেগুলোর মীমাংসা সাথে সাথে হয়ে গেলেও আজকের এই পঞ্চাশ সংখ্যার মীমাংসা হবার নয়। শ্বশুরবাড়ির মানুষগুলোর উপর আজ থেকে আস্থা রাখা বড় কঠিন হয়ে গেল ওর জন্য। খুব কঠিন। আবার ধর্ম ভাইটি যে কথা কানে কানে জানিয়ে গেল, তারইবা গ্রহণযোগ্যতা কী? কোন না কোনভাবে সময় সব কিছুর সমাধান দিতে পারে ।এটা আলোর অগাধ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের প্রমাণ বহুবার সে পেয়েছে। পঞ্চাশের বেলায়ও ব্যতিক্রম হয়নি। মাস দুয়েকের মধ্যেই যখন এক কবিরাজ মহিলা বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে বলে গেল-অমুক তো আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা নিয়া ওষুধ আনতে গেছিলো। আলো তখন ওই অমুকের চোখের সামনে আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে বলতে পারেনি-কী কারণে তাকে পঞ্চাশ টাকা চুরির দায়ে চোরের ট্যাগ লাগানো হলো। পারেনি বলতে সে কথা। পঞ্চাশ টাকা হাতিয়ে নেয়া প্রাণীটির এমনই নিদানকাল গো! কী করে পারবে ফাঁস করতে, ওই অমুক চোর? আলো পারেনি নিদারুণ হতে। পারেনি। পারেনি পাষাণ হতে। আজ পর্যন্ত না।

ওয়ালা

আনাজ রাখবেন, আনাজ? কেমন একটা বিনয়মাখা অনুরোধের সুর ছেলেটার কণ্ঠে। ভালো লাগা জাদু আছে ওর হাঁকের মধ্যে। করো নাকাল শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালবেলা তিনতলা থেকে শুনতে পাই এই হাঁক। স্বর শুনে বুঝা যায়, বয়স খুব বেশি নয় ওর। উঠতি বয়সের এক ছেলে। বেশ আগ্রহ নিয়ে কয়েকদিন ধরে বারান্দার গ্রিলের ফাঁক গলিয়ে দেখার চেষ্টা করি ওকে। ঘরে আনাজপাতি মজুদ থাকায় ডাকতেও পারি না। কী দরকার, অযথা ডেকে ওর সময় নষ্ট করার? শুধু শুধু ছেলেটার মুখ দেখার জন্য ডেকে নিরাশ করার মানে হয়? ওপর থেকে ভ্যান ভর্তি আনাজ তরকারি আর চুলে ঢাকা মাথা দেখেই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাই। মনে মনে ভাবি, আনাজপাতির মজুদ শেষ হলে ঘরের মানুষটিকে বলবো না। পরদিন সকালে ওই ছেলেটির কাছ থেকে কিনবো। ব্যাস, ওর সাথে কথাও হবে, জানাও যাবে ওকে। এরকম পরিকল্পনা যখন করি, তখন পড়তে হয় বিপাকে! দেখা গেলো, দুতিনদিন সে এ পথ মাড়ায় না। ছেলেটির প্রতি আগ্রহের একটি বিশেষ কারণ আছে। ওর ড্রেসকোড। অন্য আনাজওয়ালাদের মতো লুঙ্গি পরা, চিটচিটে ময়লা জামা বা কাঁধে ঘামের গন্ধ মাখা গামছা ফেলে আসে না। ওর পরনে থাকে নীল রঙের জিন্স আর সোল্ডারে ব্যাজ লাগানো সাদা শার্ট। দূর থেকে বুঝা যায় শার্টের পকেটে কোনো প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম লাগানো। ওর পোশাক, চলন, বলেনে মনে হয় পড়াশোনা করে। করোনাকালে সংসার চালাতে, নয়তো বেকার সময় কাজে লাগাতে এই পেশা বেছে নিয়েছে। ওর 'আনাজ নিবেন, আনাজ'-হাঁকটা শুনলেই ইচ্ছে হয় ডেকে ভ্যানের সব আনাজপাতি কিনে নেই। একদিন ছেলেমেয়েদের বললাম, শোন্, ওই আনাজওয়ালা ছেলেটার কণ্ঠে কেমন একটা বিনয়মাখা মায়া লাগানো মধুর ভাব আছে। না? অন্যসব আনাজওয়ালার মতো 'আয় আনাজ, আয় আনাজ' বলে কর্কশস্বরে হাঁকে না। মনে মনে খুব আফসোস হয়। একদিন যদি ওকে সামনাসামনি দেখতে পেতাম! করোনাকাল। ঘরে ঘরে চা পানীয়র কদর অন্য সময়ের চে একটু বেশিই বেড়েছে। অবশ্য আমার ঘরে আগে থেকেই এর চাহিদা অগ্রগণ্য। ঘুম থেকে উঠেই চুলায় চায়ের পাতিল চাপাতে হয়। ভোর ভোর ঘুম থেকে জাগা আমার পুরোনো অভ্যাস। প্রতিদিনের মতো রুটিন মাফিক হালকা ব্যায়াম সেরে, ঘর ঝাড়ু দিয়ে চায়ের জল চাপাতে গিয়ে মনে পড়লো ঘরে চা-পাতা নেই। এতো সকালে কোনো দোকান খুলেছে বলে মনে হয় না। সবে সকাল সাড়ে ছটা বাজে। ছেলেমেয়ে, ওদের বাবা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অগত্যা নিজে এককাপ ব্ল্যাক কফি বানিয়ে বারান্দায় ফোল্ড করা টেবিল খুলে কফিতে চুমুক দিতে দিতে কিছু একটা লেখার চেষ্টা করছি। প্রায় বেলা আটটা নাগাদ এভাবে কেটে গেলো। ঘরের মানুষগুলো তখনও ঘুমে। করোনার বিধিনিষেধের কারণে তেমন বাইরে যাওয়া হয় না। ঘরে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে,মাস্কে মুখ ঢেকে চা পাতা আনার জন্য নিচে নামলাম। কাছেই মুদি দোকান। কিছুটা পথ এগোতেই কানে ভেসে এলো 'আনাজ নিবেন, আনাজ?' আমার কাছে মনে হলো, আহা! স্বর্গীয় কোনো সুরের মূর্ছনা আমার কানে একটা অস্পৃর্শ পরশ বুলিয়ে দিলো। ওর মুখটা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলো। মনে মনে বলি, বাছা পৃথিবীর এই নিদানকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেনো ঘরের বাইরে ফেরি করতে এসেছো? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? ততোক্ষণে দুজন কাস্টমার আনাজ কিনতে ভ্যানের সামনে এসে যে যার দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়েছে। আমি কৌতূহলে ভ্যানে উঁকি মেরে দেখলাম কিছু কেনা যায় কিনা। নাহ! ঘরে তো এর সবই আছে। ভাবলাম, লেবু তো নিতে পারি। এই সময়ে ভিটামিন সি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। জিজ্ঞেস করলাম, লেবু কতো করে? মাস্কে ঢাকা মুখে বললো, 'আন্টি কেজিতে নিবেন, না হালি?' বললাম, এক হালি দাও? আচ্ছা, তুমি কি পড়াশোনা করো? ছেলেটি ছোট একটা পলিব্যাগে এক হালি লেবু ঢুকাতে ঢুকাতে জবাব দিলো 'জ্বি আন্টি। আন্টি আপনার লেবু।' আমি লেবু হাতে নিতে নিতে আবার প্রশ্ন করলাম -'কোন ক্লাসে পড়ো? ও সোৎসাহে জানালো,' এইটে। আরো কিছু জানতে চাওয়ার

আগেই ও নিজেই বললো-আন্টি কিশোরগঞ্জ খালার বাসায় থাকি। খালাতো ভাই বোনদের পড়াই। ওরা একজন প্লে, আরেকজন ক্লাস ওয়ানে পড়ে। অহন করোনার কারণে সব বন্ধ। জানেনই তো ছোঁয়াছুঁয়ি রোগ। খালু বিদেশ থেকে জানায়া দিলো, আমি য্যান অহন বাড়িতে থাকি। তাই চইলা আসলাম। বাবারও কোনো কাজ নাই। অসুস্থ। ওষুধ লাগে প্রতিদিন। এই সময়ে মার পক্ষে সব সামাল দেওয়া কষ্টকর। ছোট্ট একটা বোন আছে। ওর খরচ; চারজন মানুষের খাওয়া খরচ তো কম না? মা মাঝে মাঝে আমারে হাত খরচ দিতো। ওগুলো খালার কাছে জমায়া রাখতাম।আসার সময় খালা বললো, নে তোর জমানো টাকা। এই সময়ে কাজে লাগবো। করোনা আসছে অনেকদিন হইলো। শুনতাসি আরো অনেকদিন স্টে করবো। জমানো টাকায় কতোদিন? তাই মার সাথে বুদ্ধি কইরা আনাজ তরকারির ব্যবসা ধরসি। কাজের কোনো লাজ নাই। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম কথাগুলো। বাহ! তুমি তো খুব লক্ষ্মী ছেলে? বেশ বড় হয়ে ওঠেছো তুমি। 'জ্বি আন্টি?' উত্তরের অপেক্ষায় আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। আমি বললাম, ও কিছু না। তুমি বুঝবে না। ওকে লেবুর দামটা মিটিয়ে দিতে ও ভ্যানের প্যাডেলে পা দিলো। ধীর গতিতে 'আনাজ নিবেন, আনাজ?' হাঁকতে হাঁকতে এগিয়ে চললো। আমি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ওর যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকলাম। ভালো লাগায় মনটা ভরে গেলো। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম। এই যাহ! এতো কথা হলো ছেলেটার সাথে, অথচ ওর নামটাই জানা হলো না! আমার এই এক বদোভ্যাস। নতুন কারো সাথে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের যতো বিষয় জেনে নেই কিন্তু, নাম জিজ্ঞেস করতে মনে থাকে না। থাক, ছেলেটার নাম অজানাই থেকে যাক। যদি আবার কোনদিন দেখা হয়, তখন না হয় জেনে নিবো?

চাঁদ জোছনার জল

লাবণ্যর সারা শরীরজুড়ে আজ শ্রাবণের জোয়ার বইছে। নিজের প্রতি নিজেরই কেমন লোভ হচ্ছে। জোর করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা কামনার জানালাগুলো মনের দরজায় এসে আকুতি জানাচ্ছে। স্নানঘরে শাওয়ারের নিচে শরীরটাকে সঁপে দিয়ে অঝোরে কাঁদছে সে। নিজের দুই বাহু দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। স্নানঘরে ঢুকেই শাওয়ার, কল, সব চালু করে দিয়েছে। বৃষ্টি পতনের শব্দের মতো অন্যরকম এক পরিবেশ বিরাজ করছে। এভাবে কতক্ষণ যে চলে গেছে, বুঝতে পারে না ও। স্নানঘরের দরজায় যখন ধপাধপ শব্দ হয়, চকিত চোখে দরজার দিকে তাকায়। খেয়াল করে তার পায়ের পাতা জলে তলিয়ে আছে। দরজার ফাঁক গলিয়ে শোবার ঘরে চলে যাচ্ছে জলের ধারা। লাবণ্য তাড়াতাড়ি স্নানঘরের জল নিষ্কাশনের ছাকনির মুখটা খুলে দেয়। শাওয়ার, কল সব বন্ধ করে দেয়। কয়েক মিনিটে হা করা পাইপের মুখ দিয়ে জল সরে যায়। আরো কিছুটা সময় নিয়ে শুকনো কাপড় পরে বের হয়। ভেজা চুল টাওয়ালে পেঁচিয়ে কাঁধের ডান পাশ দিয়ে বুকের ওপর ফেলে রেখেছে। স্নানঘরের দরজার ছিটকিনিটা খুলে বের হতেই দেখে আরুশ আরেকবার দরজায় ধাক্কা দেওয়ার জন্য হাত উঁচু করে আছে। সে লাবণ্যর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিতও বিষন্ন হয়ে যায়। ওর মুখ থমথমে। চোখদুটো জবাফুলের মতো টুকটুকে লাল আর ভারি হয়ে আছে। লাবণ্য ওকে পাশ কাটিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। সম্ভবত স্নানঘরের জলে ভেসে যাওয়া মেঝে পরিষ্কার করার জন্য কাউকে ডাকতে গেলো। আরুশের অর্ধ অক্ষম শরীরের ভার যেন হুইল চেয়ারের ওপর কয়েকগুণ বেড়ে যায়। দুই হাতে চেয়ারের হাতলগুলো সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরে। বুকের ভেতর দীর্ঘশ্বাস সাপের মতো কুণ্ডুলি পাকাতে থাকে। নিজের প্রতি তার ভীষণ অভিমান জন্মে। কেন সে লাবণ্যকে মিথ্যে সংসারের মায়াজালে বন্দি করে রেখেছে? কেন তার পরিবার ধৈর্য ধরার নামে ওর পায়ে বিত্ত বৈভবের শিকল পরিয়ে দিয়েছে? ওকে মুক্ত করে দেয়া উচিত। নিজের জীবনকে স্বাধীনভাবে হাসি আনন্দ নিয়ে উপভোগ করার অধিকার সবার আছে। তবে লাবণ্য কেন সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? ভাবতে ভাবতে আরুশের বাবা মা, এমনকি লাবণ্যর পরিবারের মানুষগুলোর ওপর ভীষণ রাগ হয়। কষ্টে তার দুচোখ অশ্রুতে ঝাঁপসা হয়ে আসে। সাদা কাপড়ে ঢাকা অর্ধখণ্ডিত পায়ের দিকে তাকায়। ভাবে, কেন সে বছর খানেক আগে লাবণ্যকে সারপ্রাইজড করার জন্য নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে ওর বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়েছিলো। অনেক সময় অতি আবেগ, রোমান্টিকতা যে লোমহর্ষক রোমাঞ্চকর বাঁকে মোর নেয়, এখন সে প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছে। তবে অনেক সময় ব্যস্ততার মাঝেও একটু রোমান্টিক হতে কার না ভালো লাগে! এই রোমান্টিকতা যে ওদের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াবে, তা কে জানতো? আরুশ আজ লাবণ্যর কাছে একটি জড়বস্তু ছাড়া আর কিছুই না। কোন স্ত্রী না চায় এই ভরযৌবনে তার ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে অম্লমধুর সুখকর জীবন উপভোগ করতে। বিয়ের পর পর; সেদিন শরতের আকাশ জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ কেমন মায়াবী জোছনা ঢেলে পৃথিবীর বুকে উপর হয়ে আছে। লাবণ্য নীলপাড় সাদা শাড়ি, দুই হাতে দুগাছি নীল রঙের রেশমি চুড়ি, কপালে গাঢ় নীল টিপ আর খোঁপায় শিউলি ফুলের মালা জড়িয়ে ছাদবাগানে বসে আছে। আরুশ তার খোঁপায় জড়ানো ফুলের গন্ধে মাতালের মতো কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ও একটুও টের পায়নি। যখন ওকে পেছন থেকে দুবাহুতে জড়িয়ে ধরে, তখন টের পায়। সেদিন দুজন এমনই মোহনীয় চাঁদ জোছনার জলে ভেসে ভালোবাসার স্বর্গরাজ্যের সুখ উপভোগ করেছিলো। সেই দিনটি যে ওদের জীবনে ইতিহাসের পাতা হয়ে যাবে কে ভাবতে পেরেছিলো? আরুশ তো ওকে কম ভালোবাসে না? এখনও! লাবণ্যই বা সেদিক থেকে কম কিসে? কার এক্সিডেন্টের পর যখন হাঁটুর নিচ থেকে দুটো পা কেটে বাদ দেওয়া হলো, লাবণ্য ওকে সাহস দিয়েছে। মনের জোর ভাঙতে দেয়নি। ওর সমস্ত স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে ওকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছে। হাসপাতালে দিনের পর দিন

রাত জেগে অক্লান্ত পরিশ্রম আর সেবা দিয়েছে। আরুশ এখন সুস্থ। কিন্তু তার পা দুটো খোয়া গেছে চিরকালের মতো। ও চায়, লাবণ্য মানসিকভাবে খুশি থাকুক সবসময়। এজন্য সে শারীরিকভাবে বাইরে গিয়ে না পারলেও ঘরে বসে অনলাইনে বিভিন্ন পেজ ঘুরে ঘুরে ওর পছন্দের জিনিস অর্ডার করে আনে। সুন্দর রেপিং পেপারে মুড়িয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। লাবণ্য হয়তো সেগুলো পেয়ে খুশি হয়। কিন্তু সে খুশিতে প্রাণ থাকে না। শুধু একটু মুচকি হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইড টেবিল বা ফুলদানির কাছাকাছি কোথাও রেখে দেয়। আগের মতো উদগ্রীব হয়ে রেপিং খুলে দেখার আগ্রহবোধ করে না। ওর কৌতুহল যেন মিলিয়ে গেছে। দুতিন মাস যাবত লাবণ্যর এই পরিবর্তন আরুশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। শুধু আরুশ কেন, ওর বাবা মা-ও ইদানিং খেয়াল করেছেন বিষয়টা। লাবণ্য হুটহাট করে কোথায় বেরিয়ে যায়। শ্বশুর কিংবা শাশুড়ি কারোর অনুমতির অপেক্ষা করে না। আসছি বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়। বাড়ির গাড়িও খুব একটা ব্যবহার করে না। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার আজকাল প্রায়ই বাইরে থেকে খেয়ে আসে। আরুশের বাবা কায়দা করে লাবণ্যর মাকে ফোন করে কুশল বিনিময়ের ছুতোয় তাদের বৌমার অবস্থান জানার চেষ্টা করে। কোন কোন দিন লাবণ্যর মা- ই হয়তো বেয়ান বেয়াইয়ের সাথে কথা বলতে বলতে ফোনে মেয়েকে চান। তখন তারা নানা অজুহাতে বাড়িতে লাবণ্যর অনুপস্থিতির বিষয়টা এড়িয়ে যান। বুঝতে পারেন, মেয়ের এই পরিবর্তনের কথা তারা জানেন না। আরুশ দুতলার বারান্দায় হুইল চেয়ারে বসে বসে বাবা মায়ের অসহায় অবস্থা দেখে চুপচাপ। ভাবে, এই অচলায়তন ভাঙতেই হবে। সে কারোর করুণার পাত্র হয়ে থাকতে চায় না আর। দুই হাতে চেয়ারের হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ভেতর যায়। অস্থিরভাবে হুইল ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশটা দেখে। যেন এই ঘরটা তার পৃথিবী। আর সে পৃথিবীকে আবর্তনকারী কলঙ্কিত চাঁদ। চোখ যায় পূব বারান্দার দরজার দিকে। সেখানে দুধসাদা জোছনা আছড়ে পড়ছে। ভাদ্র মাস। আকাশে পূর্ণকলার চাঁদ। মনকাড়া। মোহনীয়। গ্রিলের ফাঁক গলিয়ে বারান্দায় জোছনার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। শরতের চাঁদের আলো বুঝি এমনই হয়! চেয়ারের হুইল ঘুরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসে। চোখ বুজে সেই আলো গায়ে মাখে। তার মনে হয় মোহনীয় এই চন্দ্রালোরও একটা গন্ধ আছে। সে বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়। শিউলি ফুলের তীব্র একটা সুবাস বুকের গভীরে প্রবেশ করে। আরুশ ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো চোখ খুলে। সে বুঝে উঠতে পারে না বাতাসে এমন সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে। ছাদ থেকে? নাকি পাশের বাড়ির কারোর বাগান থেকে? সে মনে করার চেষ্টা করে। চাঁদের আলোয় ভর করে এমন গন্ধ ভালো লাগায় ভরিয়ে দিচ্ছে ওকে। ওর এখন মনে পড়ছে, বিয়ের পর লাবণ্য ছাদ বাগানে অন্য ফুলের সাথে একটা শিউলির চারাও লাগিয়েছিলো। ফুলের বাগান করা ওর বিশেষ ভালো লাগার একটা বিষয়। তবে কি এতোদিনে চারাগাছটি ফুলবতী হয়ে উঠেছে? আচমকা গ্রীবার ওপর কারো হাতের স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শের ছোঁয়া পায়। কানের কাছে চুড়ির সনাৎ শব্দ স্রোতস্বিনী নদীর মতো বয়ে যায়। লাবণ্য ওকে দুই বাহু দিয়ে পেছন থেকে সবেগে জড়িয়ে ধরে।ওর নিঃশ্বাসে আদিমতার মাতাল গন্ধ। চোখ কামনার আগুনে পুড়ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাবণ্য নিজের মুখ উপুড় করে আরুশের ঠোঁটে একটা প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দেয়। মুহূর্তে ওর ভেতর ঘুমিয়ে থাকা আদিম পুরুষালি মন জেগে ওঠে। ও লাবণ্যকে পেছন থেকে হেঁচকাটানে বুকের কাছে নিয়ে আসে। ওর খোঁপায় জড়ানো শিউলিমালা খসে পড়ে বারান্দার মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আরুশের হাতের আঁজলায় লাবণ্যর মুখটা চাঁদ জোছনার জল হয়ে টলমল করছে। দুই জোড়া চোখের চাহনিতে অব্যক্ত ব্যাকুল বেদনার ঢেউ খেলা করে।